স্বপ্নের বারান্দা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আর এই সেই বারান্দা যেখানে বসে মা আকাশের তারা দেখতেন!– ঐতিহাসিক অট্টালিকার গাইডদের মতো একটা টোনে কথাটা বলে শুভেন্দু তাকিয়ে রইল আমার চোখের দিকে। ও জানে কথাগুলো আমার কানে উপহাসের মতো শোনাবে। ওর চোখের দিকে চোখ ফেলতেও আমার ঘেন্না করছে; অনেক সাবলীল এবং ভদ্র হত যদি ও সাফ-সাফ বলত, আর এখান থেকেই তোমার মা ঝাঁপ দিয়ে ওই রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলেন।

শুভেন্দুর দিকে আমি তাকিয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু আমার চোখে এই অতিশয় বিনয়ী, ভদ্রলোক ভগ্নীপতিটির চেহারার কিছুই ধরা দিচ্ছে না। আমাকে ও অমানুষ ভাবে, কিন্তু আমি ওকে কিছুই ভাবি না। ওর মাথার পিছনের নীল আকাশটাই দেখছি আমি, রাত হলে যে আকাশের তারা দেখত মা। একটু আগেই রানি বলছিল, দাদা, তুই কখনো অ্যাদ্দিনে আকাশের দিকে তাকিয়ে মা-র কথা ভাবিসনি? আমি কীরকম বিরসভাবে উত্তর করেছিলাম, ওকালতি শুরু করার পর আমার খুব একটা আকাশ দেখার ফুরসত হয়নি।

রানি ছোটো বোন, আমাকে বোঝে। ও শুধু একটা শব্দ করেছিল—জানি!

সাত-সাতটা বোনের বিয়ে দিতে দিতে কবেই যে আমার যৌবন চলে গেছে জানতে পারিনি। শুধু রানির বিয়ের পাকা দেখার দিন ও হঠাৎ করে আমার কোঁকড়া চুলের সামনেটা থেকে একটা রুপোলি সুতোর মতো বার করে বলল, দাদা, শেষে তোরও চুল পেকে গেল!

আমি একটা বেতের মোড়ায় জবুথবু হয়ে বসেছিলাম। শেষে রানিও চলে যাবে, আমি আর মা একটা বড়ো দালান আঁকড়ে পড়ে থাকব। বুকটা ভার-ভার হচ্ছিল, কিন্তু নিজের জন্য কাঁদতে আমার একদম ভালো লাগে না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ছেলেপুলে করে দেহরক্ষা করা কি খুব সমীচীন হয়েছিল পিতৃদেবের? জগতে সব দায়ই কি সংসারের বড়ো ছেলের? কিন্তু না, এসব কথা বাবাকে নিয়ে বলা যায় না। তিনি তো এক-শো বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুতে রেখেও গেলেন খুলনার বিষয়-আশয়, জমিদারি। চোখ বোজার আগে হাত ধরে বললেন, আমার কন্যাদের সৎপাত্রে দিয়ে। প্রয়োজনে বিষয় বিক্রি কোরো। শুধু এই ভিটেটুকু রেখো তোমার মা-র জন্য। আর...

না, আর কিছু বলা হয়নি বাবার। বরাবরই দেখেছি যে সবচেয়ে কঠিন প্রস্তাবগুলোই বাবা নীরবে রেখে যেতেন। আমি কিছু জমি বিক্রি করে বিলেতে আইন পড়তে যেত পারি কি না জিজ্ঞেস করতে বাবা নীরব ছিলেন। যার মানে 'হ্যাঁ'-ও হতে পারে, আবার 'না'-ও। আমার অবশ্য মনে হল বাবা আমাকে অতখানি চোখের আড়াল করতে সম্মত নন, তাই ওঁর উত্তর হিসেবে 'না'-ই বেছে নিয়েছিলাম। সুতরাং বিলেতের আশা ছেড়ে কলকাতায় এসে কালো কোট পরে আদালতে যাওয়া আসা শুরু করলাম। কিছুদিন বাদে বাবা পত্র মারফত জানালেন, আমার আশীর্বাদ নিয়ো। আমি যতদিন জীবিত আছি

এখানে টাকা পাঠাবার প্রয়োজন নেই। শুধু মনে রেখো, তোমার সাত-সাতটা বোন। আর তুমি আমার বড়ছেলে।

বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হওয়ার মুহূর্তে প্রণাম সেরে রানি বলেছিল, দাদা, তুই বিয়ে করবি না? আমি অন্যমনস্কতার ভান করে বলেছিলাম, জানি না। সবই তো কপাল।

আমার একটু অভিমানও হল সবাই কীরকম আমাকে সহানুভূতির চোখে দেখে বলে। শুধু মা বাদে। কারণ একেকটা বোনের বিবাহের পর–র একেকটা বুক-চেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনে আমার বুঝতে বাকি থাকত না যে, ওগুলো আর কারও নয়, আমার জন্য। আমি তখন খুব নাটকীয়ভাবে বলতাম, যাক, চার-চারটে পার হল। আর ক-টা হলেই স্বস্তি। আর মা তখন শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখ টিপে ধরত, ভুলেও বলতে পারত না, চুনে, তোর সংসার করতে ইচ্ছে হয় না?

বলা যায় মা এবং রানিই একজোটে আমাকে নিঃসঙ্গ করে গেল। রানি বিয়ে হয়ে বাড়ি ছাড়ল, আর মা হুমকি দিয়ে গেল—এবাড়িতে একা থাকতে আমার দম বসে যায়। তুমি বউ না আনলে আমি খুলনা ছেড়ে এখানে এসে থাকতে পারব না। আমি ম্লান মুখে বলেছিলাম, আমার কি আর বিয়ের বয়স আছে মা? গত আশ্বিনে চল্লিশ পেরুলাম, আমার তো এখন একলা থাকতেই ভালো লাগে। মায়ে-ছেলেতে তো দিব্যি আছি। তুমি খুলনা যেতে চাও যাও, তবে পুত্রবধূর অপেক্ষায় থেকো না।

মা-র ফর্সা, সুন্দর মুখটা রাগে জ্বলছিল, ফরাশ থেকে নেমে চলে যেতে যেতে বলল, তোমার বাবা কখনো আমার মতামতের তোয়াক্কা করেননি। তুমিও করবে না, এ তো জানা।

মা কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই আস্তে আস্তে বোপোদয় হল আমার; আমি বিয়ে করতে চাই না বলে নয়, পরলোকগত পিতা এবং মাকে একই সঙ্গে শাস্তি দিতে ভালো লাগে বলে। আমি চিরকুমার থাকলে ওঁদের বেশ হাস্যাস্পদ দেখায়। আমার মুহুরি রমেশ যেমন বলত, বড়দা আপনি সংসার না পাতলে বড়মার কিন্তু মরেও শান্তি নেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট সৌরেন প্রশংসা করতে গিয়ে আমার রগের ব্যথা তুলে দিত, আপনার মতো পুত্র পেটে ধরা মহা ভাগ্য, বড়োবাবু! মাঝেমাঝে রানিও এসে অস্বস্তিতে ফেলত অবান্তর কিছু সংবাদ জুগিয়ে দাদা, মা চিঠিতে তোর কথা জানতে চেয়েছে। কী লিখব? আমি বলতাম, দেখতেই তো পাচ্ছিস। যা খুশি একটা লিখে দে।

রানি মুখ গোমড়া করে বসত কিছুক্ষণ, তারপর বলত, এতদূর এলাম শুধু এইটুকু জানতে? তাহলে লিখি, তুই ভালো নেই?

আমি আশকারা দেব না বলে বলতাম, সেটা মোটেই সত্যি কথা নয়। যাবার আগে রানি একবার না একবারটি বলতই, তুই বিয়ে করবি না দাদা? আমি অন্যমনস্কতার ভান করে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতাম। রানি বলত, তুই কোনোদিনও বদলাবি না, না?

কিন্তু যখন বদলালাম, মেয়ে পছন্দ করে মা-কে চিঠি দিলাম, লিখলাম যে পছন্দের মেয়েটি আমার প্রাণের সূর্য, এমনটি আমি জীবনে দেখিনি, আমি ভালোবাসায় ডুবে আছি, আমি সংসার করব, থিতু হতে চাই, শুধু একটু উদার হতে হবে মা-কে, মা চিঠিতে লিখল, আমি তোমার ভালোবাসায় অমর্যাদা করছি না চুনীলাল, তোমার পছন্দ কখনো আর কারও চেয়ে অক্ষম হবে না, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহে আমি প্রাণ থাকতে মত দেব না। আমি মা হয়ে বলছি, তুমি এ বিয়ে কোরো না। যদি কর—তুমি বা তোমার বাবা কেউ কখনো আমার মত জানার মতো ধৈর্য রাখনি—তবে আমার মুখদর্শন কোরো

না। আমার সমস্ত আশীর্বাদ রইল তোমার জন্য, কিন্তু তোমার হাতের মুখাগ্নির প্রত্যাশা আমি করব না।

এরকম কোনো চিঠির কোনো উত্তর হয় না, অথচ কী বোকামি! কী বোকামি! একটা উত্তর আমি কিন্তু লিখেও ফেলেছিলাম—মা, তোমার সুখ হবে বলে আমি বিয়ে করছি না, কিন্তু আমার নিজের সুখের জন্যও নয়। মেয়েটির আমি দ্বিগুণ বয়সি, তবু ওর বাড়ির লোক জানাচ্ছে, আমি বিয়ে করে ওকে উদ্ধারই করব। রূপ ছাড়া ওর আর কোনো যৌতুক নেই। বড়ো গরিব পরিবার। মা, আমি বিয়ে করছি ওই মেয়েটিকে সুখী করতে। ভালোবাসা ছাড়া ওর আর কিছুই দেবার মতো নেই বলেই ওকে এত ভালো লাগছে আমার। মধ্য বয়সেও কি আমার কুলের গর্ব ত্যাগ করা উচিত নয়? এর পরেও যদি তুমি স্থির থাকো যে আমার এ মুখ তুমি দেখবে না আমি তোমায় সেই অনুরোধও করব না। তুমি আমাকে এতকাল শুধু বাবার ছেলে হিসেবেই দেখে এসেছ, এরপর দেখো আমি তোমারও পুত্র। তুমি এক পা না এগোলে আমিও এক পা এগোব না। ইতি, তোমার...

আমি মা-কে তুলে আনিনি কলকাতায়, দেশবিভাগের পর মা নিজেই চলে এল এখানে। কিন্তু আমার বাড়িতে নয়, রানির এই চৌখুপি ফ্ল্যাটে। মেয়ের সংসারে অতিথি হওয়ার গ্লানিও তুমি সহ্য করলে! অথচ কয়েকটা রাস্তা ওপারে আমার বাড়ির রাস্তা দিয়ে তুমি একটি বারও গেলে না। দেশের বাড়ির চার উঠোন জুড়ে তোমার চলাফেরা, গতিবিধি ছিল, আর এখানে এই এক চিলতে বারান্দায় বসে তুমি প্রহর গুনতে। আমার পাঠান শাড়ি, চাদর, শেমিজ তুমি যত্ন করে আলমারিতে তুলে রেখেছ, পরেছ জামাইয়ের কেনা কাপড়। আমার ছ-ছটি সন্তান হয়েছে, একটি মরেও গেছে, কিন্তু তুমি খবর নাওনি। দেশ আর কলকাতা মিলিয়ে চোদ্দোটা বছর তুমি আমার থেকে আলাদা থেকেছ, বামপন্থী সন্তানের মা দেশভাগের ন্যক্কারজনক ইতিহাসের

সাক্ষী হয়েও থেকে গেছ কংগ্রেসি। শুভেন্দু খবর দিয়েছিল ইলেকশনেও তুমি আমার বিপক্ষে ভোট ফেলেছ। গত চোদ্দো বছরে তুমি আমার কোনো কিছুই গ্রহণ করনি, এমনকী আমার শ্রদ্ধাও। তিন বছর ধরে আমি হার্টের রুগি কিন্তু আমার অসুখের কথা তোমার কানে পৌঁছুতে দিইনি। সেটা খুব হৃদয়হীন কাজ হত আমার, কারণ আমার ব্যথাও তুমি নিতে না। পৃথিবীতে আমি ছাড়া কোনো কিছুরই মূল্য ছিল না তোমার কাছে, এমনকী আমার ভালোবাসা, ব্যথা-বেদনারও নয়। এখন দেখো, তোমার এই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি আমি, কিন্তু এই আমি তোমার সেই নিখাদ, বিশুদ্ধ সন্তান নই। আমি ঊর্মির স্বামী, পাঁচ সন্তানের পিতা, সফল উকিল, ব্যর্থ রাজনীতিক, ভিটেমাটিহীন এক শহুরে ভদ্রলোক। সাত-সাতটা বোনের বিয়ে দিয়েছেন এই ভদ্রলোক, আদালতে বহু মামলা জিতেছেন, বহু সম্পর্ক খুইয়েছেন এবং একমাত্র পুত্র হয়েও নিজের মায়ের মুখাগ্নি করার সুযোগ পাননি।

আমি ফের বারান্দায় গিয়ে মা-র ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। কৌটো খুলে একটা সিগারেট ধরালাম। দেখি রানি এক কাপ চা এনে পায়ের কাছে রেখেছে। ডেকে বলল, দাদা, তুই তো এখান থেকে কোর্টে যাবি। একটু চা খা। আমি উত্তর করলাম না। হঠাৎ শুনি শুভেন্দু বলছে, চুনেদা, সময় মতো খবর পেলে তুমি কি মুখাগ্নি করতে যেতে?

এরকম প্রশ্ন এক শুভেন্দুই করতে পারে, ভদ্রতাবোধে ও ক্রমশ কীরকম নির্বোধ হয়ে গেছে। ও কি কখনো মাকে জিজ্ঞেস করেছে, মা আপনি কি খুশি হবেন চুনেদা আপনার মুখাগ্নি করলে? নিশ্চয়ই করেনি, কারণ মা যে তলে তলে পাত্তাড়ি গোটানোর স্বপ্ন দেখছিল সেটাই তো ও আঁচ করতে পারেনি। হায় কপাল! পৃথিবীটা কি এই ধরনের অর্থহীন ভদ্রতার ওপরেই চলে?

যারা পুত্রকে মায়ের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দিতে পারে না তারাই প্রশ্ন করে খবর পেলে ছেলে আসত কি না! মা এবং ছেলের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তা যে আসলে কী তা কি অঙ্ক কষে বার করতে হয়? আমি শুভেন্দুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ওকেই প্রশ্ন করলাম, আমি মুখাগ্নি করি মা তা চাইত?

শুভেন্দু ওর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রেলিঙে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। আর বলল, তুমি তো রাতের আকাশ দেখো না চুনেদা, তুমি কী করে জানবে মা কী চাইতেন?

আমি বুঝতে পারছি শুভেন্দু ইচ্ছে করে, সুযোগ করে একটা শেল নিক্ষেপ করল। আমি একটু চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, তুমি জান মা আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখত? শুভেন্দু মৃদু হেসে বলল, সম্ভবত কিছু না, তাকিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করতেন।

–তার মানে!

—তোমার বোন বলতে পারবে কী বিড়বিড় করতেন। কিন্তু ওই সময়টুকুই ওঁকে সুখী দেখতাম আমি। একবার রাতের খাওয়ার জন্য ডাকতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা ছাড়া অন্য তারা কি নেই যা জায়গা বদলায় না?

—তাতে তুমি কী বললে?

–বললাম, কোনো তারাই স্থান বদল করে না। শুধু মানুষের দৃষ্টি বদলে যায়।

আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললাম, তুমি... তুমি শুভেন্দু তুমি ওই কথা বললে? কেন? কী জন্যে?

শুভেন্দু এগিয়ে এসে আমার হাতের পোড়া সিগারেটটা আঙুলে নিয়ে বারান্দার বাইরে ছুড়ে দিতে দিতে বলল, কারণ মা কোনো তারার চরিত্র জানতে চাননি আসলে। তিনি তোমার, আমার, রানির... মানে মানুষের কথা জানতে চাইছিলেন। আমার বা রানির কথাটা খুব বড়ো কথা নয়, হোয়াট ওয়জ ইম্পর্টান্ট ইজ ইউ। ইউ আর দ্য স্টার, দ্য পোল স্টার অর হোয়টএভার ইউ চুজ টু কল ইট। তুমি চিরকাল আমাকে ভদ্রলোক বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এসেছ, কিন্তু আসল ভদ্রলোকটা তুমি। ইউ! তুমিই এতই উচ্চমনা ভদ্রলোক যে প্রতিপক্ষের পরাজয়ও তুমি মেনে নিতে পার না। মা তোমার কাছে যাননি কারণ ভেতরে ভেতরে তিনি তোমার কাছে হেরে গিয়েছিলেন। আর তুমি এতই মাতৃভক্ত ভদ্রলোক যে নিজে আসতে পারনি পাছে মা লজ্জা পায়, তাঁকে পরাজিত প্রমাণ করা হয়।

আমি শুভেন্দুর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখলাম আমার গলা জড়িয়ে আসছে। শুভেন্দু হাত তুলে আমাকে থামার ইঙ্গিত করে বলল, আমাকে আরেকটু বলতে দাও চুনেদা। তোমার মতো পান্ডিত্য আমার নেই, আমি ফ্রয়েড-ইয়ুং জানি না, চিরকাল তোমার কথাই হাঁ করে গিলেছি। কিন্তু আজ আমাকে বলতে দাও প্লিজ।

আমি ইজি চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, না, শুভেন্দু। আমি আজও তোমার কথা শোনার ধৈর্য ধরব না। বরং তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। সত্যি, তুমি কি একেবারেই ভেবে উঠতে পারনি যে মা-র ভেতরে আত্মহত্যার চিন্তা ঢুকেছে?

শুভেন্দু বলল, না।

—কিছুই মনে হয়নি?

—হ্যাঁ, একটা ভয় ছিল। মা-র স্মৃতি হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। পুরোনো কথা ছাড়া বিশেষ কিছুই মনে থাকত না। ক-বছর আগের দেশবিভাগও মা ভুলে গিয়েছিলেন। আর...

উদগ্রীব হয়ে বলে বসলাম, আর?

-হঠাৎ একদিন বলেছিলেন, আমি খুলনায় নেই দেখে চুনে যেন ও বাড়ি বেচে না দেয়। ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা হচ্ছিল, কিন্তু বাইরে তার আভাসটুকু না দিয়ে বললাম, তখন তুমি কী বললে?

শুভেন্দু মাটিতে ওর হাতের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, আমি বললাম চুনেদা চাইলেও এখন আর তা সম্ভব নয়। ওটা তো ফরেনার্স প্রপার্টি। বিদেশির সম্পত্তি। আর তা শুনে মা কেঁদে ফেলে বললেন, তাহলে আমি কোথায় ফিরব শুভ?

অন্ধকার আকাশে বিদ্যুল্লেখার মতো ঝলসে উঠল শুভেন্দুর মুখে মা-র এই কথাগুলো। আকাশপাতাল হাতড়াতে লাগলাম আমি। কলকাতায় আজ আমার এত বড়ো বাড়ি, দেশে অত বড়ো পাথর-বাঁধানো দালান, অথচ মা-র একটা মাথা গোঁজার জায়গা হচ্ছিল না! এই এক চিলতে বারান্দায় বন্দি থাকল মা পাঁচ-পাঁচটা বছর। তাও রাস্তা ভুলে...

আমার আর চিন্তাও আসছিল না। মা এই বারান্দা থেকে মুক্তি পাবে বলে... আমি রেলিঙে ঝুঁকে নীচে রাস্তা দেখলাম। আর একটা ঘোর ধরে গেল মাথায়। চর্কির মতো মগজটা ঘুরছে মাথার ভেতর। মনে হচ্ছে আমিই যেন ধাক্কা মেরে মা-কে ফেলেছি এখান থেকে। আমি দু তালুতে রেলিঙে মাথা চেপে

ধরে বললাম, কিন্তু তোমরা কী বিবেচনায় মা-র সংবাদ আমাকে দিলে না, শুভেন্দু?

ও বলল, রানি ছাড়া তোমার সব বোনেরই ধারণা ছিল তুমি পাষন্ড। তুমি তিলে তিলে মা কে হত্যা করেছ। ইট ইজ নট আ সুইসাইড, বাট মার্ডার।

-আর রানি কী ভাবে?

—ও ভাবত তোমরা দু-জনাই দু-জনার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে। আমি ওর কাছেই জেনেছি তুমি কিছুদিন আগে সেকেণ্ড অ্যাটাক সার্ভাইভ করেছ।

হে ভগবান, এই দ্বিতীয় স্ট্রোক থেকে কি আমার না বাঁচলেই চলত না। আজকের এই গ্লানি তো আমার সব আলো নিভিয়ে দিচ্ছে। আমি ডান হাতটা আলতো করে, বুকের বাঁ দিকে বোলালাম। বললাম, তোমরা জামাইরা কী ভাবতে আমার বিষয়ে?

শুভেন্দু কাছে এসে হাত ধরে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। আর বলল, অন্যদের চোখে তুমি কিছুটা দেবতা, কিছুটা অমানুষ, কিন্তু মানুষ নও।

—আর তোমার চোখে?

-আমার কোনো চোখ নেই, চুনেদা। আমি চিরকাল তোমাকে মা আর রানির চোখে দেখেছি।

–তার মানে?

–কোনো মানে নেই, চুনেদা। কোনো মানে নেই। এসব দেখার কোনো মানে হয় না।

শুভেন্দু কাঁদছে। নিঃশব্দে। ও আমার কান্নাটা কাঁদছে, আমার তো চোখে কখনো জল আসে না। আমি নিষ্পলক ওকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম, ওদের কথা ছাড়ো। তুমিও তো আমায় খবর দিতে পারতে, শুভেন্দু।

গায়ের চাদরে চোখ মুছতে মুছতে শুভেন্দু বলল, আমি কেন বলব? আমিই তো তোমাকে খবর দিতে নিষেধ করেছিলাম।

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। শুভেন্দু বারণ করেছিল আমায় খবর দিতে... শুভেন্দু। দিস স্কাউন্ড্রেল অফ আ জেন্টলম্যান! আমি ঘৃণায়, অবিশ্বাসে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—তুমি বারণ করেছিলে!

শুভেন্দু শান্ত গলায় বলল, মা-র মুখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চোখ বলে কিছুই ছিল না, ঠোঁটও ছিল না। মায়ের মুখের কিছুই দেখতে পেতে না তুমি, চুনেদা। ওই দেখাকে শেষদেখা বলা যায় না, ওই মুখাগ্নির জন্য ডেকে তোমাকে আমি অপমানিত হতে দিইনি। মুখাগ্নি আমিই করেছি।

আমার মনে হচ্ছে বুঝিবা সূর্যগ্রহণ হয়ে আকাশে অন্ধকার নেমে এসেছে। মা-র আসনে বসে আমি গ্রহতারকা দেখছি। বারান্দাটা শূন্যে ভাসছে, একটু শরীর হেলালে আমি বাইরে ভেসে যাব। আমি বুঝতে পারছি শুভেন্দু হাত ধরে আমায় তুলছে, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, রানি শুভেন্দুকে বকছে এতসব কাহিনি শোনানোর জন্য। আমি কিছুটা ভদ্রস্থ হয়ে কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে শুভেন্দুকে বললাম, তোমরা আমার বাড়ি কোনো দিন যেয়ো না, শুভেন্দু। রানি তুইও যাবি না। দিদি জামাইবাবুদের বারণ করিস। জানবি

তোদের দাদা নেই। আমি অনেক আগে থেকেই তোদের ত্যাগ করেছি। তোরা মাকে খুন করেছিস!

রানি কেঁদে উঠেছে, কী বলছ দাদা? মা চলে গেল, এখন তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে!

আমি ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, রানু, কাঁদবি না। আমাকে আর ক-টা বছর একলা থাকতে দে। আমাকে বর সাজানো হয়নি তোর, মারা গেলে প্লিজ আমার কপালে চন্দন দিয়ে তোর ওই সুন্দর হাতের লেখায় 'মা গঙ্গা' লিখে দিস। আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে, রানু। আর কটা দিন আমায় একলা থাকতে দে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছি, আস্তে আস্তে অ্যাঞ্জাইনা পেন-টাও ফিরে আসছে। ঊর্মির মুখটা চোখে ভাসছে, বড়ো অল্প বয়সে অনাথ হয়ে পড়বে মেয়েটা। ছেলেপুলেগুলোও বড্ড ছোটো। চলে যাওয়ার পক্ষে মোটেও ভালো সময় নয়। বেঁচে থাকার পক্ষেও। অনেক টাকা করতে হবে। কাউকে আমি ভাসিয়ে যাব না। এভাবে চলে গিয়ে মা সবাইকে ঊর্মির শত্রু করে গেছে। বেশ করেছে! ওদের কাউকে আমি চাই না। একলা থাকতে পারলে অনেক ভালো থাকব আমি, এটাই আমার প্রিয় জীবন। বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মা ওদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছে। মা এখন আমার, সম্পূর্ণ আমার। অসবর্ণ বিবাহের পুত্রবধূর পুজো নিতে মার আর কোনো অসুবিধা নেই। মা-র জন্য আমি ঊর্মিকে ছাড়িনি, এখন কারোর জন্য আমি মাকে ছাড়ব না। যে কটা দিন বাঁচি।